দৈনিক বাংলা 49

তারিখ 19 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষক-অভিভাবকের দায়িত্ব

সরকার শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার কাজে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতা আহবান করেছেন। সত্যি বলতে গেলে দিন কতক আগেও ইচ্ছা থাকলেও অনেকের পক্ষেই অনুরূপ সহযোগিতায় উদ্যোগী হওয়ার উপায় ছিল না। এখন তার একটা পরিবেশ তৈরী হয়েছে। আর এ সময় সংশ্লিষ্ট সকল মহল সহযোগী উদ্যোগ না নিলে শিক্ষার পরিবেশ আর কখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। নিজেদের প্রয়োজনেই তাই আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সমস্যার অন্ত নেই। যত দুঃখজনকই হোক, একটি দরিদ্র দেশের জন্যে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সন্ত্রাসের বিস্তার সব সমস্যাকে ছাপিয়ে যায়। এই একটি সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, আর এর থেকেও নানাবিধ সমস্যার উৎপত্তি ঘটতে থাকে। সন্ত্রাসের চাপে শিক্ষক–অভিভাবক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ মাত্রই সব যন্ত্রণা বুকে চেপে নীরব দর্শক সাজতে বাধ্য হন। শত ইচ্ছাতেও অনেকের পক্ষেই কিছু বলা বা করার উপায় ছিল না। সন্ত্রাস বিরোধী জোর তৎপরতার মুখে এ অবস্থার আজ পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারের দিক থেকে সহযোগিতার এ আহবান তাই খুবই সময়োচিত। আমরা মনে করি, শিক্ষক–অভিভাবকসহ সকল নাগরিককে এ আহবানে সাড়া দিয়ে জাতীয় এবং ব্যক্তিস্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার ফলে ঘরে ঘরে আজ সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আহাজারি চলছে। তবে এ কেবল সংশ্লিষ্ট ঘর বা পরিবারের সমস্যাই নয়। আদতে এর ফলে গোটা জাতির ভবিষ্যৎই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। একটি দরিদ্র দেশ তার উন্নয়নের চাহিদা মেটানোর জন্যে সাধ্যায়ত্ত সর্বোচ্চ সম্পদ শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত করে যাচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার ফলে কষ্টার্জিত এ সম্পদের অপচয় তো ঘটছেই, শিক্ষার ক্ষেত্রেও কেবল শূন্যতার যোগ বেড়ে চলেছে। অশিক্ষা আর অপ–শিক্ষার ক্রমবর্ধমান বোঝা মাথায় নিয়ে উন্নয়নের আশা তো পরের কথা, আগামী বছরগুলোতে দেশ পরিচালনার জন্যে দক্ষ জনশক্তিতে ঘাটতি পড়ার আলামত স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সীমিত সংখ্যার ভাগ্যবান সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে সমস্যা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলেও এতে সাধারণ মানুষের সংকট তীব্রতরই হচ্ছে। অবস্থা পালটানো ছাড়া তাই মুক্তির পথ নেই।

পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যেই প্রয়োজন সর্বাত্মক সহযোগিতার। এ প্রসঙ্গে সরকারের আগ্রহ ও উদ্বেগ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সন্ত্রাস দমন ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জোর প্রচেষ্টা শুরু করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এ প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। যদিও সকল স্তরের মানুষের পক্ষ থেকেই এর পেছনে প্রকাশ্য সমর্থন ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে পরিস্থিতিতে ইতিবাচক মোড় এনেছেন। সন্ত্রাসের জের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধ্যাদেশও জারী হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হতে যাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে তাই বলা যায়, সরকার আশা করার মত একটা পটভূমি তৈরী করেছেন। সকলের সহযোগিতায় এখন তাকে পূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনের জন্যে পরিকল্পিত বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে এমন ব্যবস্থা যাতে সন্ত্রাসের জন্যে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হলে কিংবা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে এর থেকে সরকারী অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে। সম্পদের অপচয় রোধ এবং জাতীয় লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্যে এ ধরনের কঠোরতার প্রয়োজন রয়েছে। তেমনি যেসব প্রতিষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত হবে তাকে উৎসাহিত করাও দরকার। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তারও বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। সন্তোষজনক পরিবেশের স্বীকৃতিস্বরূপ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারীকরণ এবং অনুদান ও অন্যান্য সাহায্যের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সব ব্যবস্থার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যারও অপেক্ষা রাখে না। তবে দন্ড যত যৌক্তিকই হোক, তা যখন নিজের উপর নেমে আসে তাকে সহজভাবে মেনে নিতে সবারই কষ্ট হয়। এমন অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যেও পরিবেশ বজায় রাখায় মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষক এবং অভিভাবক শ্রেণী এ ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারেন।

একটা নৈরাজ্যজনক অবস্থা থেকে উঠে আসার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। শিক্ষক–অভিভাবকসহ সকল শ্রেণীর নাগরিককেই তাই সচেতন এবং সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল—এ কথা ভুললে চলবে না।